

নিরাপদ প্রসব: মায়ের অধিকার

সেলিনা আক্তার

জাতিকে সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তুলতে হলে শুরুতে আমাদের মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্যের দিকে গুরুত্বারোপ করতে হবে। জাতীয় উন্নয়নে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষা অপরিহার্য বিষয়, গর্ভবতী মা ও নবজাতকের মানসম্মত পরিচর্যা এবং রোগ প্রতিরোধ করা না গেলে দেশকে তথা ভবিষ্যৎ সুরক্ষা দেওয়া কঠিন। শুরু থেকেই নানা অবহেলায় শিশুর বাড়িতে দিন সাবিনার (ছদ্মনাম) কাটছিল। গর্ভবতী হলে তারা চিকিৎসকের কাছে যেতে নিরুৎসাহিত করে। ফলে আট মাসের গর্ভাবস্থায় প্রসব বেদনা শুরু হলে শিশুর বাড়ির মুরব্বীস্থানীদের পরামর্শে একজন পড়শী ধাত্রীর সাহায্যে সন্তান প্রসব করার চেষ্টা করে। রাতভর নিদারুণ কষ্ট ভোগ করে সে। নিরুপায় হয়ে স্বামী স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ভর্তি করলে মৃত পুত্রসন্তান প্রসব হয়। কম বয়সে নিজের পছন্দে বিয়ে, অজ্ঞতা আর সচেতনতার অভাবে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে সাবিনা। অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণে সাবিনার মতো অকালে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে নানা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়েন অনেকে। মারা যাচ্ছে শিশু এবং স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছে প্রসূতি নারী। অন্যদিকে সচেতনতার অভাবে অসময়ে গর্ভধারণের কারণে কিশোরী মাতার সংখ্যাও বাড়ছে।

মা এবং বাচ্চার সুস্থতার জন্য উচ্চমানের সেবার নিমিত্তে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেটাই নিরাপদ মাতৃত্ব। এ ব্যবস্থা নেয়ার প্রধান উদ্দেশ্য মাতৃ মৃত্যুহার কমানো এবং নবজাতকের মৃত্যু ও দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা রোধ করা। নারীর মাতৃত্বকে নিরাপদ করার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে বাল্যবিবাহ রোধ। প্রতিটি পিতামাতার উচিত তার মেয়ে সন্তানকে ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে না দেওয়া। কারণ এর আগে মেয়েদের জননতন্ত্র পূর্ণতা পায় না। নারী হিসেবে সংসার পরিচালনার মানসিকতা গড়ে ওঠে না। এছাড়া প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কেও থাকে অজ্ঞ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশে মাতৃমৃত্যুর প্রধান কারণ বাল্যবিয়ে, বিশ বছরের নীচে সন্তান নেওয়া। নিরাপদ মাতৃত্বের সঠিক বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর। ১৮ বছরের কম অথবা ৩৫ বছরের বেশি বয়সে গর্ভধারণ করলে মায়ের স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। এছাড়া প্রসব-পরবর্তী রক্তক্ষরণ, শিউনি, বিলম্বিত প্রসব ও ঠিকমতো প্রসব করতে না পারায় ইনফেকশন। অন্যদিকে কম ওজন নিয়ে জন্ম, প্রি-ম্যাচিউর, জন্মের পরপর শ্বাস না নেওয়া ও নাভিতে ইনফেকশনের কারণে নবজাতকের মৃত্যু হয়।

প্রসবকালীন যত্ন ছাড়াও প্রসব পরবর্তী জরুরি কিছু যত্ন আছে যা প্রসূতি মা ও সন্তানের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন। যেমন : মাকে সর্বদা পরিষ্কার রাখা, মায়ের জন্য পর্যাপ্ত সুখম খাবার, বিশ্রাম ও যত্নের ব্যবস্থা করা। শিশুর নাভীর যত্ন, শিশুর টিকা ও শিশুর খাবার হিসেবে মায়ের দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। ইসলামে প্রসূতি ও নবজাতকের জীবন রক্ষার জন্য জোরালো তাগিদ দেওয়া হয়েছে। মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়গুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার অভাব ও ধর্মীয় গোড়ামির কারণে গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা প্রতিবছর সন্তান ধারণ করে থাকেন। এ কারণে শিশুর সঠিক পরিচর্যা না হওয়ায় পুষ্টিহীন ও রোগাক্রান্ত মা ও শিশুর সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে। অথচ মাতৃত্বকালীন অপুষ্টির কারণে রোগাক্রান্ত মায়েদের স্বাস্থ্যহানি ঘটান ফলে অনেক সময়ই মা ও নবজাতকের মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেয়।

পরিবারে নবজাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মাকে পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হয়। তাকে ভারি ও কঠিন কাজ না দিয়ে তার কষ্ট লাঘব করা যায়। ঘন-ঘন সন্তান প্রসব থেকে বিরত রাখার জন্য মাঠ পর্যায়ে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের এগিয়ে এসে জনগণকে সচেতন করতে সঠিক পরামর্শ দিতে হবে। যেসব মা স্বাস্থ্য সেবা পান না তাদের কাছে মাতৃস্বাস্থ্যসেবা পৌঁছাতে হবে। প্রসূতির প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পরিবার পরিকল্পনা সেবা আরও বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

গত কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশ সরকার মিডওয়াইফের মাধ্যমে নিরাপদ মাতৃ স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি এবং জরুরি প্রসব সেবাসহ প্রসবকালীন জটিলতায় সঠিক রেফারেল সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য মিডওয়াইফারি বা ধাত্রী সেবা মাতৃমৃত্যু হার কমাতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে মোট পেশাদার ধাত্রী আছেন ৪ হাজার ৩৯৬ জন এবং সহযোগী ধাত্রী আছেন ৭ হাজার ২০২ জন। অর্থাৎ প্রতি ১০ হাজার জনে পেশাদার মিডওয়াইফ আছেন ০.৩ জন। সারা দেশে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে রেজিস্টার্ড মিডওয়াইফগণ বিগত ২০২১ ও ২০২২ সালে প্রায় ২,৬০,৯১৫ টি স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন ১৭,৭৫,৮১৮ জন গর্ভবতী মাকে গর্ভকালীন সেবা এবং ১,৫২,০৯২ জন সেবা গ্রহীতাকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করেছে। (তথ্য সূত্র: ডিএইচআইএস-২,২০২৩)। যা দেশের মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

বাংলাদেশ জাতীয় মাতৃস্বাস্থ্য কৌশল, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ৪৭ দশমিক ১ শতাংশ থেকে ৮৫ শতাংশে উন্নীত করা এবং দক্ষ ধাত্রীর মাধ্যমে প্রসবের হার ৫০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশে উন্নীত করা। পাশাপাশি মাতৃমৃত্যুর হার এবং নবজাতকের মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা। গর্ভকালীন সময়ে কমপক্ষে ৪ বার গর্ভকালীন সেবা গ্রহণের হার ৩৭ দশমিক ২ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীত করা।

জাতিসংঘ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) তথ্যমতে, শিশু জন্ম দিতে গিয়ে বিশ্বে প্রতিদিন প্রায় ৮০০ নারী মারা যান। আর অন্ততপক্ষে সাত মিলিয়ন নারী প্রসব পরবর্তীতে গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগেন। এছাড়া আরও ৫০ মিলিয়ন নারী প্রসবের পর নানা স্বাস্থ্য জটিলতায় ভোগেন। এদিকে বাংলাদেশে প্রতিবছর ১২ হাজার নারী গর্ভধারণ ও গর্ভধারণ সংক্রান্ত কারণে মারা যায় বলে ডব্লিউএইচও জানায়। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ২০২০ সালে ৮৮৪ জন মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। গত বছর তা কমে ৭৮৮ জনে নেমেছে। এছাড়া বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) বলছে, ২০১০ সালে প্রতি লাখে মাতৃমৃত্যু ছিল ১৯৪ জন। এক দশকে তা কমে ১৬৫ জনে নেমে এসেছে।

বর্তমান সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রসূতি মায়ের দক্ষ সেবা নিশ্চিত করার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লাখে জীবিত জন্মে ৭০- এর নিচে এবং নবজাত মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১২-তে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচি (২০১৭-২২) বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এরই মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় মাতৃস্বাস্থ্য কৌশলপত্র (২০১৯-৩০) অনুমোদিত হয়েছে এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতিতে সারা দেশে কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণভাবে ইউনিয়ন পর্যায়ে মাতৃস্বাস্থ্য সেবার কাজ করে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে এই সেবাদানের কাজ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। দুই অধিদপ্তরের মতে, মাতৃমৃত্যু কমাতে তিনটি প্রধান বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়, অনিরাপদ গর্ভধারণ পরিহার, নিরাপদ প্রসব ও জরুরি প্রসূতি সেবা। এই তিনটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ গত ৫০ বছরে বিশেষ উন্নতি করেছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, মাতৃমৃত্যু কমানোর জন্য যেসকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সেগুলো হলো- জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের ছয় মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ, ডিম্যান্ড সাইড ফাইন্যান্সিং (ডিএসএফ) মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম, প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ কর্মসূচি, মাঠ পর্যায়ে অন্তঃসত্ত্বা মায়ের রক্তক্ষরণের কারণে মাতৃমৃত্যু রোধ কার্যক্রম, মাসিক নিয়মিতকরণ ও গর্ভপাত-পরবর্তী সমন্বিত সেবা, অবস্টেট্রিক্যাল ফিস্টুলারি রিপেয়ার কার্যক্রম। একই ধরনের কার্যক্রম পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকেও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া বাড়িতে নিরাপদ প্রসব সম্পন্ন করা, গর্ভকালীন জটিলতা নিরূপণ ও জরুরি প্রয়োজনে রেফার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্কিল্ড বার্থ এটেনডেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম (সিএসবিএ) চালু করা হয়েছে এবং নবজাতকের সুরক্ষায় ‘জাতীয় নবজাতক স্বাস্থ্য কর্মসূচি’ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ২০০৯ সালে নেয়া উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে প্রায় ১৪ হাজারেরও বেশি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে নারীর গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর জরুরি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতকে মজবুত ও টেকসই করতে ১০৭টি মেডিকেল কলেজ, পাঁচ হাজার ১৮২টি বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিক, প্রায় ১০ হাজার ৪০০ ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ৪৬টি বিশেষায়িত হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতাল, ৪২৮টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পাঁচ লক্ষাধিক স্বাস্থ্য সেবাদানকারী কর্মী দেশের সব প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি জাতিসংঘের ডব্লিউএইচও, ইউনিসেফ, ইউএনএফপিএ, বিভিন্ন দাতা সংস্থা এনজিও, পেশাজীবী সংগঠন ও কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যৌথভাবে কিছু কর্মসূচি চালু করেছে। নিরাপদ মাতৃত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তোলাসহ প্রসূতি মায়ের স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করার লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, জনপ্রতিনিধি ও গণমাধ্যমসহ সমাজের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এ সকল সম্মানিত উদ্যোগের মাধ্যমে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

#

পিআইডি ফিচার